ডিঙিনৌকো

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

মুখবন্ধ

বিচিত্র এই পৃথিবীতে আরও বৈচিত্র্যময় মানবজীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু এক লম্বা জার্নি—নানান অভিজ্ঞতায় গাঁথা বিনিসুতোর মালা। সময়ের হাত ধরে শৈশব কৈশোর যৌবন—একে একে পার করে এগিয়ে চলে জীবন। ফেলে আসা মধুর শৈশবের জন্য মনকেমন করে। আমার শৈশব কৈশোর কেটেছে গ্রামাঞ্চলে। বিনাবাধায় ঘুরে বেড়িয়েছি নীল আকাশের নীচে, মেঠো পথে সবুজ মাঠে, অকৃপণ প্রকৃতির মমতার আঁচলের ঘেরাটোপে। বড়োদের নজর এড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি খেলাধুলায়, সাঁতার কেটেছি পুকুরে দিঘিতে। বন্ধুত্ব হয়েছে পরিবেশ প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে। দারিদ্র্যের মধ্যে অন্তরের প্রাচুর্য দেখেছি, ঐশ্বর্যের মধ্যে হৃদয়ের দারিদ্র্যও দেখেছি। চোখের সামনে দেখেছি কাঁচারাস্তা পাকা হল। হারিকেনের আলো সরিয়ে ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। তারও অনেকদিন পরে এল টেলিফোন। আরও পরে শহরে আসা।

'ডিঙিনৌকো' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মৃদুলের ভবঘুরে জীবনকে নাড়া দেয় গ্রাম শহর প্রকৃতি দেশ—চলার পথের বাঁকে বাঁকে। শৈশব-কৈশোরের টানে নিজেকে খুঁজতে বার বার ফিরে আসে গ্রামে। তার ঘটনাবহুল জীবনের অজস্র রোমাঞ্চকর গল্পের ফাঁকে ফিরে ফিরে আসে 'ডিঙিনৌকো'। জীবনখানা ঠিক যেন এক ছোট্টো ডিঙিনৌকো—

॥ ডিঙিনৌকো ॥

পর্ব - ১

মৃদুল ব্যানার্জি এ দফায় অনেকদিন পর গ্রামের বাড়িতে এল। গ্রাম অবশ্য এখন আর সে গ্রাম নেই। আধা-শহর হয়ে গেছে। একে উন্নয়ন বলা যায় কিনা সে নিয়ে মৃদুলের যথেষ্ট ধন্দ আছে। তবে জোরগলায় সেকথা বলতে গেলে সবাই তাকে পাগল ভাববে। তাই মনের কথা মনেই রাখে। গ্রাম যত শহুরে হয়ে উঠেছে, মৃদুলের বাড়ি আসার আগ্রহ তত কমে গেছে। জীবিকার তাগিদে তাকে বাধ্য হয়ে শহরে থাকতে হয়। গ্রামে আসে মুক্ত হাওয়ায় সবুজের মাঝখানে দুদণ্ড শ্বাস নিতে। চোখের সামনে দেখল—উর্বর জমি কিভাবে সাফ করে কংক্রিটের বাড়ি-ঘর গজিয়ে উঠল। আমবাগান পুকুর সব বুজিয়ে সুপার-মার্কেট হল।

বাজারে এক-পা হাঁটতে গেলে রীতিমত গুঁতোগুঁতি করতে হয়। এখানে আর আসতে তার ভালো লাগে না। শুধু পৈতৃক ভিটে। একমাত্র দিদি ঘোরতর সংসারী। ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিল্লীতে থাকে। গ্রামে আসার বিশেষ সময় পায় না। মা চলে যাবার পরে গ্রামে আসার আকর্ষণ আরো কমে গেছে দিদির। কিন্তু মৃদুল নিরুপায়। বাবার মৃত্যুর দশবছর পরে মা চলে গেলেন। সেও পাঁচবছর হয়ে গেল। মৃত্যুর আগে ছেলের হাত ধরে বারবার বলেছিলেন, বিয়ে-থা করলি না মেনে নিয়েছি। কিন্তু পৈতৃক ভিটেটা বজায় রাখিস বাবা।

কোনো পিছুটান থাকবে না। হাতে কিছু টাকা-পয়সা জমলেই বিন্দাস হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এইসব ভাবনা থেকেই তো সংসারের ফাঁদে পা রাখেনি মৃদুল। অথচ মা ফস করে এমন একটা কথা দাবি করে বসল—সেই পিছুটান থেকেই গেল।

রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে মেনগেট খুলে ভেতরে পা রাখতে না রাখতেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। মৃদুল একছুটে সদর দরজার শেডের নিচে দাঁড়িয়ে কলিং-বেলে হাত দিল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

কাকিমনি দরজা খুলে একমুখ হেসে বললেন, আয় ভেতরে আয়। কদিন ধরে ঝেঁপে ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝেড়ে কাশছে না। এত মেঘ ভালো লাগে!

মৃদুল কাকিমনির পিছুপিছু এসে ব্যাগটা বারান্দায় রেখে কলতলার দিকে গেল হাত-পা ধোবার জন্যে।

কাকিমনি তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুই বোস, আমি খাবার ব্যবস্থা করি।

মৃদুল বলল, বাড়িতে তুমি একা আছ নাকি! কাউকে দেখছি না!

কাকিমনি বললেন, এসময় কেউ তো থাকে না। আমি কমলা আর তোর কাকামনি। বাচ্ছারা ইস্কুলে। বিপুল অফিসে। ঈশা ইস্কুলে। আর কাকিমনি যথারীতি তাসের আসরে। ফিরতে ফিরতে সন্ধে।

—কমলাদি নেই! রান্না কে করছে!

—কমলাই করে রেখে গেছে। তোর ট্রেন তো ভীষণ লেট করেছে। একঘন্টা আগেও এখানে বসে গুলতানি করছিল। কমলার নাতনি হয়েছে। তাকে দেখতে হাসপাতালে গেল। চলে আসবে এখুনি। আমি খাবার রেডি করছি। তোর ঘর খোলাই আছে। চেইঞ্জ করে নে।

—না না চেইঞ্জ পরে করব। খুব খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নিই।

—খিদে তো পাবেই। আয় খাবার ঘরে। পাঁচমিনিট লাগবে।

মৃদুলদের বাড়ির প্ল্যানটা একটু অদ্ভুত। বিশাল উঠোনের তিনদিকে তিনখানা দোতলা বাড়ি। একবাড়ি থেকে অন্যবাড়িতে যাবার পথে সরু টিনের শেড, যাতে মাথা সুরক্ষিত থাকে। দুটো বাড়ির একটা মৃদুলদের, অন্যটা কাকার। তিননম্বর বাড়ির নিচের তলায় বড়ো বড়ো রান্নাঘর, খাবার ঘর আর স্টোর। ওপরে গেস্টরুম। দক্ষিণদিকটা ফাঁকা রাখা হয়েছে আলো-হাওয়ার জন্যে। সেখানে বাগান আছে। একদিকে ফুলগাছ। আর একদিকে শাক-সবজি। এছাড়াও আম-পেয়ারা- কাঁঠাল- নারকেল-বাতাবি নানারকমের ফলের গাছ একটু দূরে দূরে ছবির মত সাজানো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দোতলার বারান্দায় রাখা আরামকেদারায় বসে বাগানের দিকে চোখ রেখে আকাশ-পাতাল ভাবতে শুরু করল মৃদুল। বৃষ্টি থামেনি। বেগ কিছু কমেছে। মেঘলা আকাশ আলো কেড়ে নিয়েছে। দূরে তাকিয়ে দিকচক্রবালরেখাও দেখা যাচ্ছে না। যতক্ষণ গ্রামের বাইরে থাকে, স্মৃতিগুলো ঝাপসা হতে হতে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। কিন্তু বাড়িতে পা রাখার পর থেকে সব কেমন তাজা হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ওইতো ছোট্টো মৃদুল খালিগায়ে তেল মেখে কলতলার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার মা দেবিকা পিছু পিছু ছুটছে তাকে ধরার জন্যে। এক-আধবার ধরে ফেললেও ধরে রাখতে পারছে না—তেলের জন্যে ফসকে যাচ্ছে। আর খিলখিল করে হেসে আধোগলায় মৃদুল বলছে—আমাকে ধরতে পারে না!

হঠাৎ কোথা থেকে কাকামনি এসে পেছন থেকে জাপটে ধরে কোলে তুলে নিয়ে দেবিকাকে বলছে—নাও জল ঢালো। আমি চেপে ধরে আছি। দেখি কেমন পালায়!

স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে আদর করতে করতে ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরে এল মা। জামা-প্যান্ট পরিয়ে চুল আঁচড়িয়ে হাত ধরে টানতে টানতে খাবারঘরে নিয়ে এল। তারপরে ঝোল-ভাত মেখে দলা পাকিয়ে একগ্রাস করে খাওয়াতে শুরু করল। মৃদুল কোনোটা গিলছে, কোনোটা মুখ থেকে ফেলে দিচ্ছে, কোনোটা থু থু করে মায়ের চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে। প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপরে গান গেয়ে শুরু হলেও প্রতিদিন খাওয়া শেষ হতো দু-চার ঘা চড়-চাপড় খেয়ে। তখন পরিত্রাতা হিসেবে হাজির হতেন ঠাকুমা।

বলতেন, ছি ছি ছেলেটাকে খেতে বসিয়ে মারছে দ্যাখো। এমন কঠিন মা জন্মেও দেখিনি। তুমি যাও আমি দেখছি। আমার দাদুসোনা, লক্ষ্মীসোনা খেয়ে নাও ... দুষ্টু করে না...

ঠাকুমার আদরে আরো ন্যাকামো বেড়ে যাচ্ছে মৃদুলের। ঠোঁট ফুলিয়ে ফলস কান্নার অ্যাকটিং। বিরক্ত মা দুপদাপ পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওইতো তার দিদি মিতালি লক্ষ্মীমেয়ের মত বারান্দায় বসে আছে। আর মা চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বিরক্ত হয়ে বলছে, কতবার বলেছি বড়ো হচ্ছ চুলের একটু যত্ন কর। এত ধুলো-ময়লা, জট পড়বে না! শোনো মিতু, কাল থেকে আমি আর তোমার চুলে হাত দেব না। মাথায় কাকের বাসা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ো। লোকে আমাকেই দোষ দেবে, মেয়ের কিছু খেয়াল রাখি না বলবে। তা বলুক। তবু এই শেষবার।

দিদি মুখ টিপে ফিক ফিক করে হাসছে। মা দেখতে পেলে থাপ্পর বাঁধা। কিন্তু মা তো পিছনে বসে বিনুনি বাঁধছে। দুটো বিনুনিতে দিদিকে খুব মিষ্টি লাগছে।

ছাড়া পেয়ে দিদি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। মা বলল, এত লাফালাফির কি আছে। যাও ভাইকে রেডি করে সঙ্গে নিয়ে বেরোও। সন্ধের আগে বাড়ি ফিরবে কিন্তু। দেরি হলে পানিশমেন্ট।

মৃদুলের জামা-প্যান্ট বদলে চুল আঁচড়িয়ে 'চল তাড়াতাড়ি' বলে ভাইয়ের হাত ধরে ছুট লাগাল দিদি। দেরি হলে লাইনের পেছনে দাঁড়াতে হবে। যে আগে পৌঁছয় সে লিডার হয়ে বাকিদের সামলায়। দিদি খুব ভালো লিডার। কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব করে না বলে সবাই ওকে পছন্দ করে। এসব তখন বুঝত না। একটু বড়ো হবার পরে বুঝতে পারত।

ওইতো দুর্গাতলার মাঠের পেছনদিকে দুটো দোলনা আর একটা স্লিপ। পুরনো জমিদারবাবুদের বিত্তবান কোনো শরিক বসিয়ে দিয়েছে ছোটোদের খেলার জন্য। বাচ্ছারা হুটোপুটি করছে। কিন্তু স্লিপ আর দোলনার কাছে কোনো হুটোপুটি নেই। কার পরে কে চাপবে ঠিক করে দিচ্ছে মিতালি। ভাইকে বারকয়েক স্লিপে চাপিয়ে, বার দশেক দোলনায় দুলিয়ে অন্য বাচ্ছাদের দলে ছেড়ে দেওয়া ছিল মিতালির রোজকার ডিউটি। আবার ফেরার সময় ধুলো-বালি ঝেড়ে ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফেরা। মেঘলাদিনে বাড়ি থেকে বেরনো যেত না। কি দুঃখ হত! তবু ভাইকে পাশে নিয়ে লালকমল-নীলকমল বুদ্ধু-ভূতুমের গল্প বলত দিদি। বড়ো বড়ো চোখে গল্পগুলো গিলত মৃদুল।...

আবার জোরে বৃষ্টি নামল। গায়ে বৃষ্টির ছাট লেগে ঘোর ভাঙল মৃদুলের। ঘরে এসে জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

দুপদাপ দুপদাপ। তিন-চার জোড়া পায়ের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে মৃদুলের ঘরের দিকে। ঘরের ভেতরে ঢুকে ফিসফাস কথা...ঘুমুচ্ছে রে। চুপ। ঘুম ভেঙে যাবে সোনাজেঠুর। মা বকবে খুব।

পিছন থেকে নিচুস্বরে ঈশা বলল, হ্যাঁ খুব বকব। সোনাজেঠুকে এখন ঘুমোতে দাও। তোমরা নিচের বারান্দায় এসে খেলা করো। জেঠুর ঘুম ভাঙলে দেখা করবে।

মায়ের প্রস্তাব চিন্টুর একেবারেই পছন্দ হল না। ওর বন্ধুদের চোখেমুখেও হতাশা।

চিন্টু বলল, ওপরের বারান্দাতে থাকি না মা! আমরা চেঁচামিচি করব না। চুপটি করে বসে লুডো খেলব।

ঈশা বলল, তোমরা চুপটি করে বসে লুডো খেলবে! আমাকে বিশ্বাস করতে হবে সেকথা! চলো...আর কোনো কথা নয়।

ওরা পিছু ফিরতেই মৃদুলের গলা—হাই বেবিজ!

হাই—বলে বেবিজ ছুটে এল মৃদুলের কাছে।

ঈশা বলল, দাদাভাই, তুমি জেগে জেগে আমাদের কথা শুনছিলে নাকি!

মৃদুল, ইয়েস ম্যাম। লক্ষ করছিলাম কেমন দাপুটে মা হতে পেরেছ!

—কি বুঝলে!

—নট ব্যাড। এখন কটা বাজে বলোতো! এই ছোকরাগুলো স্কুল থেকে কখন ফিরল!

—ছ-টা বাজছে। যা অন্ধকার হয়ে আছে, বোঝা মুস্কিল। একঘণ্টার ওপর হল চিন্টু ফিরেছে। তুমি এসেছ এটা আগে তো টের পায়নি। তা নাহলে তোমার ঘুমের রফা করে ছেড়ে দিত। দ্যাখোনা কতগুলো বন্ধু যোগাড় করে এনেছে।

—তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কেন!

—কেন আবার! সেই যে আগেরবার এসে তুমি কিসব ডিঙিনৌকোর গল্প শুনিয়ে গেছ, তারপর থেকে

আমাকে পাগল করে দিয়েছে ডিঙিনৌকো দেখাতে হবে। এখানে কোথায় ডিঙিনৌকো দেখাব বলো দেখি। ওর বন্ধুদের কাছেও তোমার ডিঙিনৌকোর গল্প পৌঁছে গেছে। ওরা সবাই এখন তোমার কাছে গল্প শুনতে এসেছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি গেলবার সুন্দরবন বেড়ানোর গল্প বলেছিলাম, তাই না চিন্টুবাবু!

চিন্টু ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তারপরে বলল, সেই যে ডিঙিনৌকোয় চেপে সরু সরু নদীতে জঙ্গলের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ইয়া বড়ো বাঘ দেখেছিলে। বাঘটা এমন তাকাচ্ছিল, তুমি ভেবেছিলে—তোমার ওপরে লাফিয়ে পড়বে। মনে পড়েছে তোমার!

মৃদুল বলল, বাঃ তোর মেমোরি তো বেশ ভালো। আমি তো প্রায় একবছর পরে এখানে এলাম। অতদিন আগে বলা গল্প ...আমিই তো ভুলে গেছি।

ঈশা বলল, 'হ্যাঁ আপনার বলা গল্প মনে রেখেছে ভেবে ভুলেও মনে করবেন না লেখাপড়া মনে রাখে। একটা কবিতা মুখস্থ করাতে দম বেরিয়ে যায়।

—কিযে বলোনা ঈশা। তোমাদের গার্জেনদের দেখছি এক দোষ! সিলেবাসের কবিতা মুখস্থ করা আর জ্যান্ত বাঘের গল্প মনে রাখা কি এক ব্যাপার নাকি! সিলেবাসের পড়া অত্যন্ত বোরিং—এটা তোমাকে মানতেই হবে। অথচ না পড়েও উপায় নেই। টিকে থাকা কঠিন।

—তোমার সঙ্গে আমি একমত দাদাভাই। ডিঙিনৌকো ডিঙিনৌকো করে এমন পাগল করে দিয়েছিল, আমি আঁকার স্যারকে বললাম, ডিঙিনৌকো আছে এমন ছবি আঁকা শেখাতে। এরপরে অন্তত দশখানা ছবি এঁকেছে চিন্টু। চিন্টু, সোনাজেঠুকে ছবিগুলো দেখিয়ো।

চিন্টু বলল, পরে দেখাব মা।

মৃদুল বলল, এবার বুঝেছি। দশ-দশটা ডিঙিনৌকোর ছবি আঁকলে বাঘের গল্প মনে থাকবে না তা হয় নাকি! কিন্তু ঈশা এককাপ চা খাব যে!

ঈশা বলল, নিশ্চয়। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

দ্রুতপায়ে চলে গেল ঈশা।

মৃদুল বলল, তো বেবিজ তোমরা আমার কাছে গল্প শুনতে এসেছ, তাইতো!

সবাই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ।

মৃদুল বলল, কি গল্প শুনতে চাও?

চিন্টু বলল, ওইযে তুমি কত জায়গায় ঘুরতে যাও, সেইসব ঘুরে বেড়ানোর গল্প শুনব আমরা।

—ঠিক আছে। আগে বলো ফুল, পাখি, জীবজন্তু, নদী, পাহাড়, সমুদ্র—এগুলোর মধ্যে কার কোনটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে! আমি একটা করে নাম বলব—তোমরা হাত তুলবে।

সবাই সমস্বরে বলল, হ্যাঁ—

—ফুল কার কার বেশি প্রিয়!

চারটে হাত।

—পাখি!

চারটে হাত।

পাহাড়, সমুদ্র জীবজন্তু—সব কিছুতেই চারজনের হাত উঠল।

মৃদুল বলল, 'বাঃ ভেরি গুড! ফুল-পাখি এটসেটেরা সবকিছুই আসলে খুব সুন্দর। কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! আজ তাহলে পাখির গল্প বলি!

সমস্বরে প্রতিবাদ, না না ডিঙিনৌকোর গল্প শুনব।

—ওরে বাবা ডিঙিনৌকো এত ফেমাস হয়ে যেতে পারে একথা তো কোনোদিন ভাবতে পারিনি! ঠিক আছে গল্পের মাঝে মাঝেই ডিঙিনৌকো আসবে। তাতে চলবে কি?

সমস্বরে, চলবে চলবে!

ওঃ কান ঝালাপালা হয়ে গেল! এই নাও দাদাভাই তোমার চা—চায়ের ট্রেটা মৃদুলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঈশা হাসতে হাসতে বলল, আমিও গল্প শুনব।

মৃদুল বলল, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। বেবিজ ঠিক করবে এই আসরে তুমি অ্যালাউড কিনা। কি বেবিজ!

চিন্টু গম্ভীর হয়ে বলল, থাকতে পারো। তবে চুপচাপ থাকতে হবে।

ঈশা ঘাড় নেড়ে বলল, ইয়েস স্যার!

মৃদুল বলল, ঈশা, ঘরের কাছেই সুন্দরবন। তোমরা চিন্টুকে নিয়ে ঘুরে আসতে পারো। তাহলে নিজের চোখে ডিঙিনৌকো দেখতে পাবে। আঁকা ছবি দেখে জানবে—ডিঙিনৌকো কেমন দেখতে!

ইশা বলল, কথাটা ঠিক বলেছ দাদাভাই। কিন্তু তুমি তোমার ভাইকে তো জানো। তোমার সম্পূর্ণ বিপরীত। কুঁড়ে দি গ্রেট! ঘর থেকে নড়বে না কিছুতেই।

—আরে ওর ঘুরতে ভালো লাগে না, ও ঘুরবে না। তাই বলে তোমরা বেরোবে না ঘর থেকে! বাইরে না বেরোলে জগতটাকে চিনবে কি করে? কত বৈচিত্র, কত বিস্ময় ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির কোলে! প্রকৃতির চেয়ে বড়ো শিক্ষক আর কিছু আছে!

—দাদাভাই তুমি আমাদের মা-ছেলেকে বেড়ানোর সঙ্গী করে নেবে?

—তা কি করে হবে! আমি ভবঘুরে মানুষ। বেরনোর কোনো ঠিকঠিকানা থাকে না। বেশিরভাগ সময় ট্রেনে রিজার্ভেশন না করেই চেপে পড়ি। নেহাত কলেজের চাকরি, তাই হুটহাট বেরিয়ে পড়া যায়। তবে স্টুডেন্টদের বিপদে ফেলে যাই না। মনটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে, একটু মুক্তির শ্বাস নেবার জন্যে ঝোলা কাঁধে দুম করে বেরিয়ে পড়ি। তোমরা আমার সঙ্গে এভাবে বেরোবে কি করে!

চিন্টুরা রীতিমত বিরক্ত হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল ওদের মুখের চেহারা অঙ্গভঙ্গিতে। ওদের শান্ত করার জন্যে মৃদুল বলল, ধৈর্য ধরো বৎস। ব্যাকুল হয়ো না। গল্প শুরু হল বলে। ঈশা এ ব্যাপারে পরে সিরিয়াস আলোচনা হবে। এখন গল্প। বাই দ্য বাই, ঈশা, তোমার মেয়েটা কোথায়! তাকে তো দেখছি না।

ঈশা বলল, তিনিও স্কুল থেকে ফিরে তোমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলেন। কোচিং-ক্লাস কাটানোর চেষ্টায় ছিলেন। আমি আজ স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফেরায় অসুবিধা হয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে কোচিং-ক্লাসে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

—ওর কোন ক্লাস হল? সেভেন?

—হ্যাঁ সেভেন।